

আনন্দশিক্ষা বাগানের আজন্ম শিক্ষক

তারিখ: 31 MAY 2016
পৃষ্ঠা: 20

■ সাজ্জাদ রানা, কুষ্টিয়া

গুণ একটা ছুরি হাতেই আক্রমণকারী হিংস্র বাঘকে মেরে ফেলেছিলেন; তাই তার নাম হয় বাঘা যতীন। পরে তিনি হয়ে ওঠেন স্বাধীনতাসংগ্রামী বিপ্লবী। তার মা শরৎশশী ছিলেন স্বভাবকবি। যে গ্রামটিতে তাদের বাড়ি, সেখানেই জন্ম ও বসবাস নাসির উদ্দিনের। একপাশে গড়াই, অন্যপাশে পদ্মা নদী— দুই নদীর কিনার ঘেষে অপরূপ এক দৃশ্যপটে বিভূত এই কয়া গ্রাম। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার কয়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের জন্ম স্বভাবকবি শরৎশশীর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ দশক পরে, ১৯৪৬ সালে। স্বভাবকবি নন তিনি— তবে আজন্ম শিক্ষক নিশ্চয়ই বলা যায় তাকে। ছয় দফা আন্দোলন শুরুর বছর ১৯৬৬ সালে, দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তিনি তার দুই বন্ধু সুশান্ত ও

অন্য খবর

দুলালকে নিয়ে গড়ে তোলেন নৈশ বিদ্যালয়। তারপর মুক্তিযুদ্ধের সময়টুকু বাদে ১০ বছর শিক্ষাদান অব্যাহত রাখেন। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর গ্রামের নিরক্ষর মানুষজন লেখাপড়া করতে আসতেন সেখানে। সেই থেকে শুরু তার শিক্ষকতার। পঞ্চাশ বছর ধরে সেই কাজ অব্যাহত রেখেছেন তিনি। সত্তর বছরে পৌঁছে এই অবসরজীবনেও তিনি তার বাড়ির আঙিনার বাগানে দান করছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আনন্দশিক্ষা। কেননা তার আকাঙ্ক্ষা আমৃত্যু শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার। তার বাগানের ফল-ফুল, গাছ-ঔষধি গাছ আর পাখিপাখালির নিবিড় কোলে শিশুরা হেসেখেলে বইপত্র পড়ে প্রতি

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

আনন্দশিক্ষা বাগানের আজন্ম শিক্ষক

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

শুক্রবার। যে শৈশব নগরের শিশুদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব, সেই ঈর্ষণীয় আনন্দময় শৈশবের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছে কয়া গ্রামের শিশুরা।

কৈশোরে নৈশ বিদ্যালয় গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে নাসির উদ্দিন শিক্ষার আলো ছড়ানোর যে ব্রত গ্রহণ করেন, তা দৃঢ় ভিত্তি পায় কয়েক বছর পর, ১৯৬৯ সালে। স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি। তার থানা বা উপজেলা কুমারখালী নানা কারণেই ঐতিহ্যশালী। এখানে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, রয়েছে লালনের আখড়া, রয়েছে মীর মশাররফ হোসেন ও বাঘা যতীনের নানা স্মৃতিচিহ্ন। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও তাকে নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধের পর পর ১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের খেলোয়াড়রা ভলিবল খেলতে আসেন কুষ্টিয়াতে। খেলাধুলায় আগে থেকেই আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল তার— ওই খেলা দেখার পর তা আরও ঘনীভূত হয়। অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে নিজের গ্রামে ভলিবল খেলার প্রচলন ঘটান তিনি। তার প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে ব্যবসা করেছেন। তাদের মধ্যে সোবাহান ও শাজাহান এখনও সংবাদপত্র পড়েন।

শিশুদের আনন্দশিক্ষা বাগান : ২০০৭ সালে অবসরে যান শিক্ষক নাসির উদ্দিন। এর আগেই ২০০৫ সাল থেকে তিনি তার বিলুপ্ত বৃক্ষবাগানে শুরু করেন নতুন এক শিক্ষাবাগানের কাজ। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারে তার বাগানে বসে শিশু-কিশোরদের মেলা। দল বেঁধে সেখানে আশপাশের গ্রাম থেকে আসে ছোট ছেলেমেয়েরা। কেউ হয়তো বই পড়ে, কেউ আবার দোলনায় ওঠে দুলতে থাকে। দড়ি ঘোরানো খেলায় মেতে ওঠে অনেক। আবার কেউ একা-একাই গাছ চিনতে থাকে। উন্মুক্ত স্থানেই রাখা হয় গ্রন্থাগারের অনেক ফাইল— যেগুলোতে কাটিং-ক্লিপিং করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পত্রিকার নানা প্রতিবেদন। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, চমকপ্রদ বিভিন্ন ঘটনা, বিদেশের নানা স্থান ও নানা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন রাখা হয় ফাইলগুলোয়। যাতে শিশু-কিশোররা উৎসুক হয়ে ওঠে পৃথিবীকে জানতে। যাতে তাদের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর হয়। এ সবের মধ্যে শিক্ষক নাসির উদ্দিনও থাকেন হাতে বাঁশি আর কাঁধে লম্বা ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে। এই হয়তো তিনি শিশুদের সঙ্গে মেতে আছেন কোনো খেলাতে, আবার হয়তো মনোযোগী হয়ে বই নিয়ে আলাপ করছেন কারও সঙ্গে। এখনও যে শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করেনি, তাদের হাতের লেখা ও অক্ষর চেনানোর কাজটিও হয় এই আনন্দশিক্ষার বাগানটিতে। তাদের উচ্চারণ সঠিক করতে পড়ানো হয় উচ্চৈঃস্বরে।

সমকালের কাছে নাসির উদ্দিন বলেন, 'গ্রামে এখন শিশুদের একত্র হয়ে হাসি-আনন্দে মেতে ওঠার সুযোগ কমে আসছে। শহরের অনুকরণে কেউ কেউ আবার সন্তানদের কঠোরভাবে লেখাপড়া করানোর ব্যাপারে অতি মনোযোগী। কিন্তু সামাজিকভাবে আনন্দ ও খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার সুযোগ না থাকলে শিশুদের লেখাপড়া করার সুষ্ঠু আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে না।' তিনি জানান, এ উপলব্ধি থেকেই বাগানের মধ্য এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এ বাগানের গাছে ফলের মৌসুমে ফল উৎসব হয়। খেলাধুলা ও পড়াশোনার পর তাদের গাছের ফল খাওয়ানো হয়। এসব দেখতে দেখতে তিনি অনারকম এও আনন্দ পান, ভূষিতে তার মন ভরে ওঠে। পাখিদের জন্যও প্রতিটি গাছের কিছু ফল রেখে দেন তিনি।

নাসির উদ্দিনের এ বাগানে প্রতিটি গাছের সঙ্গে মনীষীদের বিভিন্ন বাণীও টাঙানো আছে। পেরেক ঠেকে নয়, সুতা দিয়ে বাঁধা এসব বাণীসংবলিত স্তিকার। 'সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ গড়ে তুলুন', 'সহজ পথে খ্যাতি বা সফলতা আসবে না, এ জন্য চাই বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা', 'না বুঝে মুখস্থ করার অভ্যাস প্রতিভাকে ধ্বংস করে', 'গাইড বই কখনও মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না', 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করুন', 'মাদককে না বলুন, গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও', 'গ্রামে গ্রামে

পাঠাগার গড়ে তুলুন'সহ অসংখ্য বাণীসংবলিত স্তিকার সারা বাগানে ছড়ানো। এগুলো শিশুদের পড়ানো হয়। এসব বাণীর মর্মকথা শিশুদের মনে গেঁথে গেলে তাদের জীবনে অনেক কাজে লাগবে জানালেন নাসির উদ্দিন।

বিলুপ্ত বৃক্ষ সংরক্ষণ : পৃথিবীকে সবুজ রাখতে, বিলুপ্ত গাছ সংরক্ষণেও একনিষ্ঠ কর্মোদ্যোগী শিক্ষক নাসির উদ্দিন। প্রায় ৪০ বছর আগে তিনি বিলুপ্ত গাছ সংরক্ষণের কাজ শুরু করেন। ওই সময় নিজের বাড়ির আঙিনায়ও গড়ে তোলেন বৃক্ষবাগান। সেখানে এখন রয়েছে ১৭০টি প্রজাতির গাছ। এখানে ১১০ প্রজাতির ঔষধি গাছ ও ২২ প্রজাতির ফলদ গাছ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো বনকাঁঠাল, ফলশাহী, মিষ্টি আমলকী, মিষ্টি কামরাসা, মিষ্টি করমচা, দুর্লভ প্রজাতির জামরুল, মরিচ, হরগোড়ি, দুধরাজ, বনশোন, হাসনাহেনা, যজ্ঞভূমুর ইত্যাদি। প্রতিটি গাছের নাম লেখা কাগজ লেমিনেট করে লাগানো আছে বৃক্ষের সঙ্গে— যাতে শিশু ও দর্শনার্থীরা তা পড়ে সেটিকে চিনতে ও জানতে পারে। প্রতি বছর অনেক গাছের চারা রোপণ করেন তিনি। শিশুদের ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিকে সে সব চারা দেন লাগানোর জন্য।

মায়ের নামে গ্রন্থাগার : বই পড়ার নেশা থেকে বাড়ির একটি কক্ষে মায়ের নামে একটি পাঠাগার গড়ে তুলেছেন নাসির উদ্দিন। বইয়ের পরিমাণ কম হলেও সেগুলো খুবই সুসজ্জিত। পাঠাগারের দেয়ালে টাঙানো রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেগম রোকেয়া, জয়নুল আবেদিন, চে গুয়েভারাসহ দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি। বিভিন্ন মনীষীর বাণীও লাগানো আছে পাঠাগারের প্রবেশদ্বারে ও ভেতরের দেয়ালে। পাঠাগারের এসব বই ঘরে পড়ে থাকে না। সেগুলো নিয়ে তিনি নিজেই চলে যান আশপাশের এলাকা ও বিভিন্ন স্কুলে। বিভিন্নজনকে সে সব পড়তে দেন। আবার পড়ার পর ফেরত আনেন। এলাকার প্রত্যেককে তিনি সব সময় পাঠাগার গড়ে তোলার পরামর্শও দেন।

সবার মনে তিনি : কথা হলো সুমাইয়া, রাসেল, তানভির ও নাসিমের সঙ্গে। এই চার শিক্ষার্থী জানাল, কয়েক বছর ধরে এই বাগানে এসে গল্পের বই পড়েছে তারা। নানা ধরনের বই পড়ে ও ছবি আঁকতে ভালো লাগে তাদের। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী ইয়াসমিন জানালো, এক বছর ধরে সে এখানে এসে বই পড়ে, খেলাধুলা করে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন থেকে সম্প্রতি নাসির উদ্দিনকে 'শিশুদের নাসির স্যারকে' সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে ক্রেস্ট ও সনদ। এই যুগেও মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন না তিনি। ফোন কেনার চেয়েও তার আগ্রহ ছিল শিশুদের জন্য বই ও খেলনার সরঞ্জামাদি কেনাকাটার ব্যাপারে। অথবা গাছের নতুন চারা কেনার ব্যাপারে। জেলা প্রশাসন থেকে তাই তাকে একটি মোবাইল ফোনও কিনে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন তার সম্পর্কে সমকালকে বলেন, 'প্রতিটি এলাকায় নাসির উদ্দিনের মতো একজন ভালো ও উদ্যোগী মানুষের প্রয়োজন। তা হলে গোটা এলাকাই বদলে যাবে। আমরা শিক্ষিত ও শ্রমশীল একটি ভালো প্রজন্ম পাব। তার এই কর্মোদ্যোগ প্রতিটি এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে।'

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেলা আক্তার বলেন, 'নাসির স্যার স্কুলে এসে শিক্ষার্থীদের বালাবিয়ে ও মাদক সম্পর্কে সচেতনতামূলক কথাবার্তা বলেন। শিক্ষার্থীদের নিয়ে বইমেলা করেন। তাদের প্রতিভা আর ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেন না। তার কাছ থেকে শুধু শিশুরা নয়, সকলেই অনুপ্রেরণা পায়।'

এলাকার চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপন সমকালকে বলেন, 'পহেলা বৈশাখ নববর্ষের দিন শত শত ছেলেমেয়েকে নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে র্যালি করেন তিনি। শহীদ দিবস, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস পালনেও অগ্রণী ভূমিকায় থাকেন নাসির উদ্দিন। তার কাজের জন্য আমরা গর্বিত।'

শিক্ষক নাসির উদ্দিন জানালেন, আমৃত্যু শিশু-কিশোরদের সঙ্গে এভাবে কাজ করে যেতে চান তিনি।